Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 61
Website: https://tirj.org.in, Page No. 542 - 548
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 542 - 548
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

ভারতীয় সভ্যতায় নারী : বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ

ড. রুবেল পাল
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যা মহাপীঠ
কামারপুকুর, হুগলী
Email ID : rubelpalsans513@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Manusanhita, Rigveda, Sri Sri chandi, Ramayana, Mahabharata, Gargi, Lopamudra, Sita, Savitri, Draupadi, Arundhuti, Ansuya, Nivedita, Sarada.

Abstract
Since the Vedic Age, Women in India have always been hailed as an integral part of the society and considered as equal to men in every facet of life. In the Vedic Age, we came across at least 27 to 30 names of women of renown and scholarship such as Gargi, Maitreeye, Apala etc. These women were acclaimed as connoisseur of art, literature and philosophy with an enlightened vision to approximate the Supreme Being. In Devi Suktam in 10th Mandala of Rigveda, composed by the female Brahmavadin Vakh Rishi, declared herself as the Supreme Caretaker of the world. We find the reference of Goddess Ratri, who, in Rigveda, as the protector deity from the evil forces. Later, Swami Vivekananda had hailed Sita as the symbol of tolerance, stoic wisdom and hence, ideal of all Indian women. In fact, before the Abrahamic intrusion, the social status of women in India was high and admirable. In the Medieval and the Colonial period, women such as Queen Ahalyabai, Laxmibai and pious women such as Mother Sarada Devi, Bhubaneswari Devi deserve mention. Women revolutionaries such as Pritilata Waddedar, Beena Das, Ujjwala Mazumder fought against the British empire with great dedication, valour and undaunted spirit. Contrary to that, in the Western Civilization, women did not get the right to vote till 1920s. In Central Asian states such as Afghanistan, Pakistan, Syria, Iran, Iraq, women have still been treated as sub-human species devoid of any human right and social security. Thus, it is high time that we should introspect our past and rewrite the history based of evidences and facts, rather than biased preconceived notions. The purpose of this paper is to offer a diachronic study of the position of women in India through scriptures, evidences and objective overview of history.

Discussion

ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যে চিরকালই নারীজাতিকে সম্মানের উচ্চ শিখরে স্থান দেওয়া হয়েছে। বৈদিক সাহিত্য থেকে পুরান, এবং তৎপরবর্তী রামায়ণ ও মহাভারত, আমরা সর্বত্রই দেখতে পাই নারী জাতিকে কিভাবে মর্যাদার শিখরে রাখা হয়েছে। বিশেষত বেদ হল ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের সবচেয়ে বৃহত্তম এবং দীর্ঘস্থায়ী সাহিত্য। বৈদিক যুগে অত্যন্ত বিদ্বান ও

বুদ্ধিমান নারীদের আমরা দেখতে পাই, যারা মানব সভ্যতার গঠনে সক্রিয়ভাবে অত্যন্ত সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ঋকবেদের বিভিন্ন সূত্রে আমরা প্রায় ২৭ থেকে ৩০ জন ঋষিকা বা নারীর উল্লেখ পাই, যারা একাধারে ব্রহ্মবাদিনী ও উচ্চ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী। এই সকল ব্রহ্মবাদিণী ঋষিকারা নিজেদের পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা জগতের কল্যাণ কার্যে নিজেদেরকে সর্বদা উৎসর্গীকৃতা করেছিলেন। এই রকমই একটি ঋকবেদের সূক্ত হল দেবীসূক্তম্ বা অম্ভৃণিসূক্ত। এটি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দশম অনুবাকের ১২৫তম সূক্ত। এতে মোট আটটি শ্লোক আছে। প্রথম এবং তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্লোক ত্রিষ্টুপ ছন্দে রচিত। কেবল দ্বিতীয় সূক্তটি জগতী ছন্দে রচিত।

অনেকের ধারণা এই সূক্ত থেকেই শক্তির আরাধনা শুরু হয়। এটি ঋষি আম্ভৃণীর কন্যা বাক্ দ্বারা সৃষ্ট। সাধারণ অর্থে সূক্তটি দ্বারা নারীর শক্তি, মহিমা, ব্যাপকতা ও কর্মের প্রকাশ পায়। এই 'দেবীসূক্তে'[১] ব্রহ্মবাধিনী অম্ভৃণ কন্যা যে সকল পুরুষ দেবতাদের সাথে বিচরণ করেন এবং যাদেরকে ধারণ করেন সেই বিষয়ে তিনি উদ্ঘোষণা করেন, -

"অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।।"[২]

অর্থাৎ আমিই রুদ্র, বসু, আদিত্য এবং বিশ্বদেবতারূপে বিচরণ করি। মিত্র ও বরুণের আমিই ধাত্রী। ইন্দ্র, অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমার দু'জনকে আমিই ধারণ করে থাকি। এই ব্রম্ভবা তিনি নারী আরো বলেন যে তিনি হলেন স্বয়ং রাষ্ট্রের অধীশ্বর-অধীশ্বরী (রাষ্ট্র নায়িকা) এবং অর্থ প্রদানকারী (অর্থ মন্ত্রী)। তিনি বলেন যে, -

"অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসুনাম চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম।
"তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্।।"[৩]

অর্থাৎ আমি জগতের অধীশ্বরী, ধনপ্রদায়িনী। ব্রহ্মকে জ্ঞাতা আমার আমিই যাঁদের জন্য যজ্ঞ করা হয় তাদের মধ্যে প্রথমা। বহুরূপে সর্বভূতে প্রবিষ্টা সেই আমাকে বহুস্থানে বা সর্বদেশে আরাধনা করা হয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় তথা বিভিন্ন মুসলমান সংস্কৃতি, বিশেষতঃ আব্রাহামিকদের কাছে যখন কিছুদিন আগে পর্যন্ত নারী জাতিকে ভোটদানরূপ স্বাধীনতা প্রয়োগ অর্থাৎ গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার পক্ষপাতী ছিল, তখন তার নিরিখে কয়েক হাজার বছর আগে থেকেই নারীজাতিকে বিশ্বশক্তির আধার রূপে মর্যাদা দিয়েছে। বিশেষতঃ খ্রিস্টানরা এবং মুসলমানরা নারী জাতিকে ক্ষেত্রেই তাদের দৈনন্দিন জীবনের ভোগ্য সম্পদ রূপে ব্যবহার করার পথ দেখিয়েছে। এখনো পর্যন্ত ভ্যাটিকান সিটিতে নারী জাতিরা দানের অধিকার থেকে বঞ্চিত আছে। আর এই ক্ষেত্রে ভারতবাসীরা সর্বদাই নারী জাতিকে ঋষিকুল্য অথবা দেবী তুল্যরূপে পূজা করেছে এবং তাদেরকেই সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিষ্ঠাত্রীরূপে মর্যাদা দিয়েছে। এই ক্ষেত্রে আমরা বেদেবেদে, পুরান, তন্ত্র, রামায়ণ ও মহাভারত থেকে কয়েকজন দেবীর নাম উল্লেখ করতে পারি। এনারা হলেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, পার্বতী, রাত্রি, চন্ডী দুর্গা, কালী, মিতা এবং রাধা। যেমন লক্ষ্মী এমন একজন নারী, যিনি হলেন একাধারে সৌন্দর্য, ভাস্কর্য, শিল্প এবং সম্পদ ও শ্রীবৃদ্ধির প্রতীকস্বরূপা।

তাই এই প্রসঙ্গে ঋকবেদের শ্রীসূক্তে বলা হয়েছে, -

"ঔণ || হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম্ |
চংদ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ ||"[৪]

অর্থাৎ হে ভগবান অগ্নি, আমি স্বর্ণবর্ণের, হরিণের মতো, সোনা ও রৌপ্যের মালা দ্বারা সুশোভিত, যিনি চন্দ্রের মতো দীপ্তিমান, সেই সোনালি রঙের দেবী লক্ষ্মীকে আহ্বান জানাই। দেবী লক্ষ্মী তার আশীর্বাদে আমাকে কৃপা করুক।

"তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনী"ম্ |
য়স্যাং হিরণ্যং বিংদেয়ং গামশ্বং পুরুষানহম্ ||"[৫]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 61
Website: https://tirj.org.in, Page No. 542 - 548
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অর্থাৎ হে ভগবান অগ্নি, আমাকে দেবী লক্ষ্মী দান করুন যিনি কখনও ত্যাগ করেন না। তিনি খুশি হলে আমি সোনা, গরু, ঘোড়া এবং চাকর পেতে পারি।

আমরা ঋগ্বেদে (দশম মন্ডল) এবং তন্ত্রে যে রাত্রিদেবীর উল্লেখ পাই, তিনি হলেন আসলে আমাদের যে জীবনের অন্ধকার ও অশুভ দিক সেখান থেকে উদ্ধারের শক্তি। আমরা ঋকবেদের রাত্রিশুঁকতে দেখতে পাই রাত্রিদেবীরূপী যে নারী মূর্তি, তিনি এমনই শক্তিশালী যে, তার কাছে গ্রামবাসী, পশুপাখি বাজপাখি, প্রত্যেকেই নেকড়ে বাঘ, চোর দস্যুদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করছে। অর্থাৎ এখানে এটাই দেখানো হয়েছে যে একমাত্র নারীরাই এই পৃথিবীকে সুরক্ষা দিতে পারে এবং সুন্দর ও সুস্থ রাখতে পারে। এই প্রসঙ্গে রাত্রিসূক্তে বলা হয়েছে, -

"সা নো অদ্য যস্যা বয়ং নি তে যামন্নবিক্ষহি।
বৃক্ষে ন বসতিং-বঁযঃ॥ ৪।।
নি গ্রামাসো অবিক্ষত নি পদ্বংতো নি পক্ষিণঃ।
নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ॥ ৫।।
যাবযা বৃক্যংং বৃকং-যঁবয স্তেনমূর্ম্যে।
অথা নঃ সুতরা ভব॥৬।।"[৬]

অর্থাৎ এখানে প্রথম চার এবং পাঁচ নম্বর শ্লোক মন্ত্রে দেখানো হয়েছে অন্ধকার নেমে এলে কিভাবে পশুপাখি গ্রামবাসী এমনকি বাজপাখিরাও অসহায় হয়ে তাদের বাসায় ফিরে যায় এবং ষষ্ঠ মন্ত্রে সেই রাত্রির দেবী শক্তিধারিণীর কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে তিনি যেন তাদেরকে রক্ষা করেন। আবার এই রাত্রিসূক্তেই এবং ঋকবেদের বিভিন্ন ঊষাসূক্তে ঊষাকে রাত্রির বোন হিসাবে দেখানো হয়েছে যিনি অন্ধকার থেকে আমাদেরকে আলোর দিশা দেখান।

"নিরু স্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যাযতী।
অপেদু হাসতে তমঃ।।"[৭]

তন্ত্রোক্ত রাত্রিসূক্তে বলা হয়েছে, নারী শক্তির ধারাই জগত ধৃত আছে, জগত সৃষ্ট হচ্ছে এবং জগত পালিত হচ্ছে। আবার সরস্বতী হলেন জ্ঞান, বিদ্যা প্রভৃতি শুভ শক্তির প্রতীকস্বরুপা। মা পার্বতী যিনি হলেন আদর্শ জননী, গৃহকর্ত্রী, সন্তানের পালনকারিণী শিব পত্নী।

এছাড়া বৈদিক যুগের আরো অন্যান্য বিদুষী নারীদের মধ্যে অন্যতমা হলেন গার্গী, লোপামুদ্রা, অরুন্ধতী, অনসূয়া, ঘোষা, লোপামুদ্রা, অপালা ইত্যাদি। এছাড়াও মধ্যযুগ থেকে বর্তমান যুগের যে সকল মহীয়সী রমণীরা ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন এবং তাদের স্বতন্ত্র ও স্বকীয়তার দ্বারা বিশ্বের দরবারে নারীশক্তির নজির রেখেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, মীরা, দুর্গাবতী লক্ষ্মীবাঈ জিজাবাঈ, অহল্যা বাঈ হোলকার, সারদা দেবী, রানী রাসমণি প্রভৃতিরা। এই নারী জাতির প্রশংসা করতে গিয়ে একাত্মতা স্তোত্রে বলা হয়েছে, -

"অরুন্ধত্যনসূয়া চ সাবিত্রী জানকী সতী।
দ্রৌপদী কণ্ণগী গার্গী মীরা দুর্গাবতী তথা॥
লক্ষ্মীরহল্যা চন্নম্মা রুদ্রমাম্বা সুবিক্রমা।
নিবেদিতা সারদা চ প্রণম্যা মাতৃদেবতাঃ॥"[৮]

শুধু তাই নয় আমরা যদি আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন মহাপুরুষদের মায়েদের, পত্নী ও ভগিনীদের জীবনের দিকে লক্ষ্য করি তাহলেও বুঝতে পারব ভারতীয় নারীরা আসলে কি রকম ছিলেন। এদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন স্বামী বিবেকানন্দের মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী, বিদ্যাসাগরের মা ভগবতী দেবী, আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মা চন্দ্রামণি দেবী, জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতিনি অবলা বসু এবং ঋষি অরবিন্দ ঘোষের ভগিনী সরোজিনী দেবী। শুধু তাই নয়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 61
Website: https://tirj.org.in, Page No. 542 - 548
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রামে যে সকল বিপ্লবী নারীরা তাদের সাহস ত্যাগ ও তিতিক্ষার দ্বারা দেশ রক্ষার জন্য যোগ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, - প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, বীণা দাস, সুহাসিনী গাঙ্গুলী, ইলা সেন, সুলতা কর, কমলা দাশগুপ্ত প্রমূখরা। বস্তুতপক্ষে আমরা যদি এই সকল নারী জাতির জীবন ও চরিত্র বিশ্লেষণ করি তাহলেই বুঝতে পারব ভারতীয় সমাজে নারীদের স্থান কি উচ্চ পর্যায়ে ছিল। আর এই ভারতীয় নারীদের প্রশংসা করতে গিয়েই স্বামী বিবেকানন্দ তার স্বদেশ মন্ত্রে বলেছেন, 'তো মার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী'। আর এই ভারতীয় নারীদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 'ভারতের মহাপুরুষগণ'- এই শীর্ষক বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ সীতা চরিত্র বিষয়ে বলেছেন,-

> "সীতা সম্পর্কে কি বলা যায়? অতীতের এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় বিশ্ব সাহিত্যেও সীতার মতো নারী-চরিত্র দুর্লভ। সীতা অতুলনীয়া। এই চরিত্র চিরায়াত এবং মাত্র একবারই সৃষ্টি হয়েছে। রামের ন্যায় চরিত্র আরো অনেক পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু একাধিক সীতা সম্ভব নয়। সমগ্র আর্যাবর্ত জুড়ে সহস্রাধিক বৎসর ধরে সীতার চরিত্র সকল নরনারী ও শিশুদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে চলেছে, কারণ সীতা মূর্তিমতী ভারতীয় নারী, তার মধ্যে প্রকৃত ভারতীয় নারীর সকল আদর্শ গুণাবলী মুহূর্ত হয়েছে। ...ভারতীয়দের মর্মস্থলে সীতার আসন চিরন্তন। আমরা সকলে সীতারই সন্তান, কারণ প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর রক্তে সীতার আদর্শ প্রবহমান। আমরা দেখতে পাই ভারতীয় নারীগণকে ফিতার আদর্শ থেকে বিচ্যুত করে আধুনিক করে তোলার প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু তা কখনও সফল হবে না। ভারতীয় মেয়েদের শীতার আদর্শে গড়ে ওঠা এবং স্বীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করাই একমাত্র উপায়।"[৯]

এই সীতা চরিত্র সম্বন্ধে আমরা নানান রকম কুৎসা করে থাকি। একদল সীতা চরিত্রের চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তার পবিত্র সত্তাকে কালিমালিপ্ত করে থাকে। আবার আরেক দল তার প্রতি অহেতুক করুণা দেখাতে গিয়ে তার চরিত্রের যে দৃঢ়তা ও পবিত্রতা, তাকেই খাটো করে তোলে। আমরা যদি মূল রামায়ণ ভালো করে অধ্যয়ন করি তবে সেখানে দেখতে পাব, ভাতৃ সমরক্ষণের সাথে তার যে সম্বন্ধ, তা মনে হয় বর্তমান যুগে মাতা-পুত্রের সম্পর্কের নিরিখেও অত্যন্ত বিরল ঘটনা। তাছাড়া সীতাদেবী চারিত্রিকভাবে এতটাই দৃঢ়মনা ছিলেন যে, রাবণের মতো মহাজ্ঞানী, মহাবলশালী রাক্ষসও কখনো তার মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহস করেনি। শুধু তাই নয়, সীতাদেবী তাঁর নিজের আত্মমর্যাদা ও চারিত্রিক পবিত্রতাকে জগতের সামনে প্রমাণ হিসাবে উদাহরণ স্থাপন করার জন্য নিজেই স্বেচ্ছায় অগ্নিতে প্রবেশ করে অগ্নিপরীক্ষা দিয়েছিলেন। আবার রামায়ণের অন্তিমে আমরা দেখতে পাই, সীতা একজন নারীর প্রকৃত আত্মমর্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখতে নিজেই স্বেচ্ছায় পাতালে প্রবেশ করেছিলেন।

তাছাড়া আমরা মহাভারতের যুগেও বহু বীরাঙ্গনা নারীদের উল্লেখ পাই। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন দ্রৌপদী। ভরা সভায় দুঃশাসনদের দ্বারা লাঞ্ছিতা হওয়ার পর দ্রৌপদী তার কেশ বন্ধন করে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যতদিন পর্যন্ত না তিনি এই দুর্যোধন, দুঃশাসনদের রক্তে তার বেণীকে তিনি সিক্ত করতে পারবেন, ততদিন তিনি তার কেশবন্দ নি খুলবেন না। আর আমরা দেখলাম তার পরিণামে কিভাবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধনদের পরাজয় সংঘটিত হলো।

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের ভক্তি আন্দোলনের নেপথ্যে যে সকল মহীয়ষী নারীরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তাদের মধ্যে মীরাবাঈ ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন একজন রাজপুত রাজকুমারী। বর্তমান রাজস্থান রাজ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাল্যকালেই চিতোরের রাজা সঙ্গার পুত্র ভোজরাজের সাথে মীরার বিবাহ হয়। কিন্তু মীরাবাঈ এতটাই ভক্তিপরায়ণা রমণী ছিলেন যে, তিনি শৈশব থেকেই শ্রীকৃষ্ণকে তার পতি বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট বাবরের আক্রমণে তার স্বামী ভোজরাজের মৃত্যু হলে, মীরা এই জগতের অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। মীরাবাঈ ১২০০ থেকে ১৩০০টি গান রচনা করেছিলেন, যা আজও সমগ্র জগতে মীরার-ভজন হিসাবে অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ। বস্তুতপক্ষে ভক্তিবাদী ধারায় রচিত তাঁর এই গান গুলির মাধ্যমে তিনি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর প্রেম নিবেদন করেছিলেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 61
Website: https://tirj.org.in, Page No. 542 - 548
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ঝাঁসীরে রানী লক্ষ্মীবাঈ ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষ্মীবাঈ ভারতবর্ষের ইতিহাসে একজন বীরাঙ্গনা বিপ্লবী নেত্রী হিসেবে চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে রয়েছেন। এছাড়াও তিনি ঝাঁসীর রাণী বা ঝাঁসী কি রাণী হিসেবেও সর্বসাধারণের কাছে বহুলভাবে পরিচিত। ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৫৭ সালের ভারতীয় সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম প্রতিমূর্তি ও পথিকৃৎ হয়ে রয়েছেন তিনি। মারাঠা শাসনাধীন ঝাঁসী ভারতের উত্তরাংশে অবস্থিত যা বর্তমানে বারানসি শহরের কাছাকাছি উত্তরপ্রদেশে রয়েছে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ ব্রিটিশদের প্রবল আক্রমণের হাত থেকে তাঁর সৈন্যদলকে তিনি নিরাপদে সরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরপর ফুলবাগের কাছাকাছি গোয়ালিয়ারে তিন দিন ধরে প্রবল যুদ্ধে রানী প্রাণত্যাগ করেন।

এছাড়াও ভারতবর্ষের ইতিহাসে অহল্যাবাঈ হোলকার ছিলেন একজন বীরাঙ্গনা মারাঠা নারী। ভারতবর্ষের ইতিহাসে রানী অহল্যাবাঈ ছিলেন একজন মহান এবং অগ্রণী মন্দির নির্মাতা। তিনি সারা ভারতে শত শত মন্দির ও ধর্মশালা নির্মাণ করেছিলেন। ১৭৫৪ সালে কুমহেরের যুদ্ধে অহল্যাবাঈয়ের পতি খান্দেরাও হোলকর মারা যান। তার ঠিক ১২ বছর পরে, তাঁর শ্বশুরমহাশয়, মল্লাররাও হোলকর মারা যান। এক বছর পর তিনি মালওয়া রাজ্যের রানী হিসাবে দায়িত্বভার নেন এবং তিনি আক্রমণকারীদের লুটপাট থেকে তার রাজ্যকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধে সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দেন। এরপর তিনি তুকোজিরাও হোলকরকে সেনাপ্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন।

বস্তুতপক্ষে আমরা আজকে নিজেদেরকে উন্নত করার ক্ষেত্রে যে ইউরোপীয় সভ্যতার উদাহরণ নিজেদের সামনে অথবা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গনে উপস্থাপন করি, তা যে কতটা ভ্রান্ত এবং মনগড়া ও পক্ষতাবাদদুষ্ট তা একবার প্রকৃত ইতিহাস পুনরায় পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারব। বস্তুতপক্ষে আমরা যদি রোমিলা থাপার, ইরফান হাবিব এবং রামচন্দ্র গুহ ইত্যাদি ঐতিহাসিকদের মনগড়া ইতিহাসই শুধুমাত্র না পড়ে থাকি তাহলে স্পষ্ট তুই বুঝতে পারব ভারতীয় সভ্যতায় নারী এবং পুরুষদের যে স্বাধীনতা অনেক প্রাচীনকাল থেকেই আবহমানকাল সুরক্ষিত হয়ে আসছে। আর আমরা যে গ্রিক ও রোমান ইউরোপীয় সভ্যতার দোহাই দিয়ে থাকি, যদি তার ঐ ইতিহাস পর্যালোচনা করি দেখতে পাবো সেখানে কেবল 10 শতাংশ মানুষ তাদের স্বাধীনতা বা গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে ভোট দান প্রয়োগ দিতে পারতো। আর এই 10 শতাংশই ছিল পুরুষ, বাকি ৯০% মানুষের সাথে তারা পশুদের মতো আচরণ করতো এবং তাদেরকে ভোগ্য পণ্যের মতো ব্যবহার করত। এরাই ছিল প্লেবিয়ান (plebians) নামে অভিহিত। এই দশ শতাংশ লোকদের পেট্রিশিয়ান (patrician) বলা হত, যারা প্লেবিয়ানদের শোষণ করত, এবং এই শোষণ তৎকালীন ইউরোপীয় সমাজে বৈধ হয়েছিল। শুধু তাই নয়, আমরা নারী স্বাধীনতার উল্লেখ করতে গিয়ে যখন ইউরোপীয় নারীদের উদাহরণ নিজেদের সামনে প্রস্তুত করি, তখন আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে, মাত্র আজ থেকে একশ বছর আগে বিংশ শতাব্দীতে সেখানে নারীদের ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়। ১৯১৮ সালে জার্মানি মহিলাদের ভোটদানের অধিকার সুনিশ্চিত করে। ১৯৭১ সালে সুইজারল্যান্ড মহিলাদের ভোটদানের যোগ্য মনে করে। আমেরিকা 1920 সালে নারীদের ভোটদানের অধিকার দেয় এবং তা নানা শর্তসাপেক্ষে। এইভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই কাল খন্ডেই ভোটদানের অধিকার নারীদের দেয়া হয়। যে ফ্রান্সকে আমরা সাম্য ও সমানতার প্রতীক বলে মনে করি, সেই ফ্রান্সই কখনো নারী এবং পুরুষদের সমান বলে মনে করেনি। শুধু তাই নয় মাত্র ১৯৪৪ সালে নারীদেরকে তারা ভোটদান কেন্দ্রে প্রবেশ করার সুযোগ করে দেয়। আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়াতে মাত্র কয়েক দশক আগে পর্যন্তও মূলনিবাসী জনজাতিদের ভোট দান অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। আবার কিছু কিছু ইউরোপীয় দেশে যদিও মহিলাদের মতাদিঘার প্রয়োগে সুযোগ দেয়া হয়েছে, তা শুধু কেবল শ্বেতাঙ্গ মহিলাদেরই। কিন্তু যারা কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা, তাদেরকে আজও অচ্যুত মনে করা হয়। আজ বিশ্বে এমন একটি দেশ আছে, যা হলো ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের পীঠস্থান ভ্যাটিকান সিটি, যেখানে এখনো পর্যন্ত মহিলাদের ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়নি। এটা হল খ্রিস্টান ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্কৃতি, যাদের থেকে আমরা কিছু বিকৃত মস্তিষ্ক ভারতীয়রা আজও নারীজাতির স্বতন্ত্রতা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য লালায়িত থাকি এবং অপরকে উপদেশ দিয়ে থাকি।

আর মুসলিম দেশে যে নারীদের কি অবস্থা তা হয়তো আমরা অনেকেই জানি। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, বাহারিন ইত্যাদি দেশের দুধ নারীদের স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ থেকে চলাফেরায়,

সর্বত্রই বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে আমরা অনেকেই ওয়াকিবহুল। সৌদি আরবে ১৯১৫ সালে নারীদেরকে ভোটাধিকার দানে সম্মতি দেওয়া হয়। সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২০০৬ সালে নারীদেরকে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়। কুয়েতে ২০০৫ সালে নারীদেরকে ভোটদানের যোগ্য বলে বিবেচিত করা হয়। বস্তুতপক্ষে এই দুই প্রমুখ আব্রাহামিক দেশের বিভিন্ন গ্রন্থে নারীদেরকে পায়ের জুতো, পুরুষের খাদ্য এবং শয়তানের কন্যারূপে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু আমরা আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের প্রথম থেকে যে আলোচনা, সেই আলোচনা থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি এই ভারতবর্ষে নারীদের স্থান কতটা উচ্চ মর্যাদায় সমাস এনেছিল। তারাই ছিলেন বিশ্বের সৃষ্টিকারীণী, পালনকারীনি, লয়কারিণী তথা রাষ্ট্রের অধীশ্বরী, সুখ-সমৃদ্ধি-শান্তিপ্রদারিনী। এইভাবে ভারতীয় সমাজ সব সময় তার নারী জাতিকে উচ্চতার শিখরে সম্মান প্রদর্শন করেছে এবং তাদের পূজার মধ্য দিয়েই এই ভারত বর্ষকে দেবতার পূজার স্থল গড়ে তুলেছে। আর এই প্রসঙ্গেই মনুসংহিতায় মনু মহারাজ বলেছেন, -

“যত্র নার্য্যস্তু তু পুজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।।”[১০]

অর্থাৎ যেখানে নারীজাতির পূজা হয় সেখানেই দেবতারা সচ্ছন্দে বিচরণ করেন। কিন্তু যেখানে এই নারীজাতির অমর্যাদা হয় সেইখানে সমস্ত কাজ বিফল হয়। স্বামী বিবেকানন্দ তার বিভিন্ন বক্তৃতায় দেশ-বিদেশে মনুসংহিতার এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করে ভারতবর্ষে কিভাবে নারী জাতিকে সম্মান দেওয়া হয়, তার উল্লেখ করেছেন। মন মহারাজ এই ভারতীয় সভ্যতায় নারী জাতির গুরুত্ব বিষয়ে আরো বলেছেন, -

“শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্ধতে তদ্ধি সর্বদা।।”[১১]

অর্থাৎ যে সমাজে নারী জাতির শোষণ করা হয় ,সেই সমাজ খুব শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যেখানে নারীজাতির শোষণ হয় না, সেখানেই সমস্ত উন্নতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং ভারতীয় সভ্যতার আধারস্বরূপ বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরান, ইতিহাস তথা তৎকালীন স্মৃতিশাস্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থের আলোচনা তথা মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের নারীজাতির গৌরবময় ইতিহাসের পর্যালোচনা থেকে আমরা একথা স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে, ভারতীয় সমাজে সর্বদাই নারীজাতির স্বাধীনতা এবং মর্যাদা নিঃসন্দেহে সুরক্ষিত ছিল। এই বিষয়ে আমি এই বর্তমান প্রবন্ধে একটি বাহ্যিক রূপরেখা অংকন করার চেষ্টা করলাম।

Reference:

১. ঋগ্বেদ, ১০/১০/১২৫
২. তদেব, ১০/১০/১২৫/১
৩. তদেব, ১০/১০/১২৫/৩
৪. তদেব, শ্রীসূক্তম্, মন্ত্র-১
৫. তদেব, শ্রীসূক্ত, মন্ত্র-২
৬. তদেব, ১০/১২৭/১-৮
৭. তদেব, রাত্রিসূক্ত, মন্ত্র-৩
৮. একাত্মতা স্তোত্র, শ্লোক -১০ ১১
৯. Complete works; vol.3, 8th edituon. P.P 555-56 (মাদ্রাজ, the Sages of India, শীর্ষক বক্তৃতা)
১০. মনুসংহিতা -৩/৫৬
১১. তদেব, ৩/৫৭

Bibliography:

অনির্বাণ, বৈদিক সাহিত্য (বেদ মীমাংসা প্রথম খন্ড), কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, প্রথম সংস্করণ, ২০০৬
চক্রবর্তী, ধ্যানেশনারায়ণ, রামায়ণ (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, নিউলাইট, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতি শান্তি, বৈদিক পাঠসংকলন, কলকাতা, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১৪১১
বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু, মনুসংহিতা, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, প্রথম সংস্করণ, দোলযাত্রা, ১৪১০
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅশোককুমার, মনুসংহিতা, কলকাতা, সদেশ, দশম সংস্করণ, ২০১০
বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়চন্দ্র, বেদ সংকলন, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, প্রথম সংস্করণ, ২০০১
মুখোপাধ্যায়, রামশংকর, শ্রীশ্রীচণ্ডী, হুগলি, কামারপুকুর, শতদল (শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যা মহাপীঠ), ২০০৪
বসু, অনিল চন্দ্র, মনুসংহিতা, কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০১
বসু, ডঃ সুতপা, শ্রীশ্রীমাসারদা মাতৃত্বের দর্শন, আসানসোল-১, ডলি পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ, ২০১৯